ঘুমে কে জাগে

ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী

কালচার-এর বিশেষ প্রকাশ

২৩শে কার্ত্তিক ১৩৮৯ শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাদ

প্রথম প্রকাশ : ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৮৯
১০ই নভেম্বর, ১৯৮২
'কালচার'এর ৩য় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রকাশক : শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেন্টার
অব্ কালচার এণ্ড এডুকেশন
৩৪৮, গাঙ্গুলী বাগান, নাকতলা,
কলিকাতা-৭০০০৪৭

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান : (১) বালক ব্রহ্মচারী ধাম, সুখচর, ২৪ পরগণা
(২) শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্টি পরিষদ
১৭/২ বি, সেন্ট্রাল পার্ক,
কলিকাতা-৭০০০৩২

প্রচ্ছদ : বীকৃপ

মুদ্রণ : শুভ্রা প্রেস
২৬/১ ডি, শশীভূষণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

বাঁধাই : রায়চৌধুরী প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং সার্ভিস
১-এ হুজুরীমল লেন,
কলিকাতা-৭০০০১২

মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত চিকিৎসক স্বর্গীয় সুদর্শনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গুরু-সঙ্গ-স্মৃতি স্মরণে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রদ্যোৎ রঞ্জন ঘোষ (খোকন) এই মহৎ তত্ত্ব-সুধা সম্বলিত পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্যের ব্যয়ভার গ্রহণ করায় আমরা তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী সেন্টার
অব্ কালচার এণ্ড এডুকেশন
পক্ষে
শ্রীহরিবন্ধু রায়
সম্পাদক

ভূমিকা

ঠাকুর সব সময় প্রকৃতির সুরে ভরপুর থাকেন বলেই শত কাজে ব্যস্ত থেকেও, হাজার হাজার লোকের হাজার রকম সমস্যা ও ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে রেখেও তিনি সকল সময়ই অতি-সজাগ, অতি-সচেতন। তাইতো যখন তখন, যে কোনো পরিবেশ বা পরিস্থিতিতেই তিনি সহজ সরল ভাষায়, ঘরোয়া কথা-বার্তার ভিতর দিয়ে কতো দুরূহ তত্ত্বের অবতারণা করেন, কঠিন কঠিন সমস্যার এমন সমাধান করে দেন আজও শাস্ত্র-গ্রন্থে যা রহস্যেই আবৃত। এমনই একটি সারগর্ভ সমাধানই রয়েছে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায়। মৃত্যুর পর কিছু আছে কি নেই, এ প্রশ্ন চিরন্তন। আজও তার সঠিক মীমাংসা হয় নি। ঠাকুর সেই সমাধানই করে দিয়েছেন ঘরোয়া আলাপের ভিতর দিয়ে, আমাদের পরিচিত ঘুম ও স্বপ্নের ঘটনার মাধ্যমে। এখানেই মহানের মহত্ত্ব, বিরাটের বিরাটত্ব। তাইতো তাঁর তুলনা তিনিই।

প্রকাশক পক্ষে
শ্রুতি-লেখিকা
সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়

ঘুমে কে জাগে

গাড়ী যে চলে কে তাকে চালায়? Engineএর ভিতরে একটা steam work চলে বলেই গাড়ী চলে। আবার গাড়ী চলতে চলতে যখন সাময়িক থামে, না চললেও তখন ভিতরে steam work চলতেই থাকে। এই যে steam work এটা সব সময়ই active, কোনো অবস্থাতেই কারও জন্য wait করে না বা থেমে থাকে না।

মহাকাশের অনন্ত তত্ত্বে, গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি অণুপরমাণুতে প্রকৃতির ধারাপাতায় এই ধারাই ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে যে একটি অন্তর্নিহিত শক্তি যেন সব সময় কাজ করে চলেছে। এই শক্তিই যেন গতিরূপে প্রতি বস্তুতে বিদ্যমান। এই গতির ধারাতেই জীবজগৎ আবর্তনে বিবর্তনে রূপ হতে রূপান্তরে পরিবর্তনের ধারায় এগিয়ে চলেছে।

Fan যখন চলে তার গতির পেছনেও একটা energy কাজ করে, আবার fan যখন বন্ধ করে দেওয়া হয় তখনও একটা energy থাকে যদিও তার বাহ্যিক প্রকাশ দেখা যায় না। এই ধরণের steam work বা energy সব সময় কাজ করে চলেছে আমাদের brain বা মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক বা মন কখনও কর্মবিহীন অবস্থায় থাকে না। তবে সব সময় চট করে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয়। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যখন অক্লান্ত পরিশ্রম করে steam work যে চলছে সেটা তখন সহজেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও যে steam work চলে তা সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় আমরা যে স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্নটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এর মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারছি? নিদ্রা তো এক ধরণের মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। নিদ্রিত অবস্থা তাই এক জাতীয় সাময়িক মৃত-অবস্থা। প্রতিদিন সবাই আমরা নিদ্রার মাধ্যমে অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুর পথে পাড়ি জমাচ্ছি। সেই নিদ্রিত বা সাময়িক মৃত-অবস্থায় এই যে স্বপ্ন দেখা তার মাধ্যমেই আমাদের জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে মৃত্যুর

পরও জীবনের অস্তিত্ব বজায় থাকে। এটা কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য, প্রমাণে প্রমাণিত।

মৃত্যুর পর কি আছে কি নেই তা নিয়ে বহু শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে। কত শত দার্শনিক, টীকা ও ভাষ্যকার কত তর্কবিতর্কে মেতেছেন, কিন্তু কোনো সমাধানেই পৌঁছাতে পারেন নি। এ অন্তহীন রহস্য তাই রহস্যেই রয়ে গেছে, আজও তার সমাধান হয়নি। কিন্তু ঘুমিয়ে থেকেও আমরা যে স্বপ্ন দেখি তার ভেতর দিয়েই nature বুঝিয়ে দিচ্ছে যে মৃত্যুর পরও কিছু না কিছু আছে। এই যে কিছু আছে, কি আছে, কিভাবে আছে জানতে পেরেছো কি? সেটাতো আজও নিখোঁজের মাঝেই রয়ে গেছে। কিন্তু খোঁজের মাঝে না এলেও একেবারে যে নিখোঁজ তাও তো বলা চলে না। নিদ্রিত অবস্থায় দেহটা মৃতবৎ থাকলেও সে অবস্থাতেও মন ঠিকই তার কাজ করে চলেছে। কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মন কিভাবে কার্য্যকরী হচ্ছে সেটা পরবর্ত্তী কথা, কিন্তু এই নিদ্রিত অবস্থাতেও মনকে *নেই* বলে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তাই মৃত্যুর পর কিছু হবে কি না, হচ্ছে কিনা, অথবা আদৌ কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না তার প্রমাণ যে একেবারেই নেই তা বলা চলে না। একভাবে না একভাবে প্রকৃতি এই ধরার ধারাপাতায় তার পূর্বাভাস বা ইঙ্গিত ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে।

প্রত্যেকেরই এমন একটা বয়স (age) আসে যখন আগের কথা সে স্মরণে আনতে পারে না। কিন্তু সেজন্য আগের ঘটনাবলীর অস্তিত্ব তো অস্বীকার করা যায় না। Conception (গর্ভ) হবার পর অনেকগুলো stage পার হয়ে তারপর জীব ভূমিষ্ঠ হয়। তারপর ধীরে ধীরে জীব বাড়তে থাকে। এই যে বিভিন্ন stage পার হয়ে তুমি এসেছো আজ সে stageগুলো তোমার আর মনে নেই। এই যে বিস্মরণ এটা কেন হবে? এটা হওয়ার তো কথা নয়। কিন্তু বিস্মরণ যে হচ্ছে সেটা তো ঠিক। তবে বিস্মরণ হচ্ছে বলেই আগেকার stageগুলোতে তুমি যে ছিলে না সেটাও প্রমাণিত হয় না।

২/৩ দিন বয়সের যে শিশু সেও নিশ্চয়ই দেখতে ও শুনতে পায়, কিন্তু কোনো কিছুই স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে না। সেই শিশুই যখন বড় হয়ে ওঠে তার মাঝে যে বুঝটুকুনু দেখা যায় সে তো ঐ একদিনের

শিশুর মাঝেও ছিলো ঠিকই। শিশু অবস্থায় তার বুঝের কোনো প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় না বলেই তার বুঝ নেই একথা বলা চলে না। শিশুর মাঝেও সব বুঝই আছে, কিন্তু মনে হয় যেন চিন্তাধারাগুলো ভাসমান বা অন্য অবস্থায় এলোমেলো হয়ে আছে।

ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তি ঘুমিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘুমের মাঝেও তো স্বপ্নে কতো কি ঘটে যায়। স্বপ্নে তুমি নানা জায়গায় ঘুরছো, কতো কি কথা বলছো, *হিসি* করছো, কতো ঘোরাঘুরি করছো, অথচ তুমি কিন্তু খাটে ঘুমিয়েই আছো। এমনও দেখা গেছে কেউ হয়তো স্বপ্নে *হিসি* করেছে এদিকে বিছানা ভিজে গেছে। স্বপ্নে হয়তো সাঁতার কেটেছে, সকালে উঠে দেখে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। এটা কি করে সম্ভব হয় সে কথায় আমি এখন যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, এই যে স্বপ্নে কথা বলছো, চলাফেরা করছো, আমি তাকে স্বপ্ন হলেও অবাস্তব বা অলীক বলবো না। এটা পুরোপুরি বাস্তবেরই কথা। স্বপ্নকে যদি অলীক বলো, মিথ্যা বলো, তবে স্বপ্নের যে ঘটনা তা বাস্তবে ঘটবে না। স্বপ্ন অবাস্তব হলে স্বপ্নের কাণ্ডকীর্ত্তির কথা তুমি বাস্তবে বলো কি করে? চিন্তা করে দেখো, ঘুম থেকে উঠে তুমিই বলছো, 'কাল রাত্রে স্বপ্নে বাবার সাথে দেখা হলো, তারপর ছোটোবেলার সেই গ্রামে গেলাম, পাঠশালার মাস্টার মশাইর সাথে দেখা হলো। তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন। তারপর ভজহরির দোকানে গিয়ে কতো মিষ্টি খেলাম। হঠাৎ দেখি সাপে তাড়া করেছে আর আমিও ছুটছি। সাথে সাথে ঘুম ভেঙ্গে গেলো, আমি জেগে গেলাম।' ঘুমের মধ্যে তুমি যা যা করেছো তা যদি অলীক হয় তবে জেগে গিয়েও তুমি সে সব ঠিক ঠিক বর্ণনা করলে কি করে? তা বলার অধিকার তোমার থাকে কি করে? আগেই বলেছি, ঘুমও একজাতীয় মৃত্যু। তা হলে দেখা যাচ্ছে এই ঘুমরূপ মৃত্যুর মাঝেও তুমি ঠিকই কাজ করে চলেছো। পাঁচ জায়গায় না গেলে পাঁচজনের সাথে কথা বলতে পারতে না, জেগে উঠে সে কথা বলাও সম্ভব হতো না। এই যে ঘুমিয়ে থেকেও জাগরণের মতো কাজ করে যাওয়া-এ তো বড় সাংঘাতিক কথা! এই যে ক্ষমতা এটা যে প্রকৃতির কতো বড় দান তা চিন্তাও করা যায় না।

অনেকে তো চোখ মেলেও ঘুমায়। চেয়ে থাকলেই কি সব সময় দেখা যায়? দেখা যায় না। ঘুমের মাঝে তো চোখ বন্ধ থাকে, তা হলে ঘুমের মাঝে দেখো কি করে? মুখ তো তখন বন্ধ থাকে, কথা বলো কি করে? ঘুমের মাঝে হাত পা থেকে শুরু করে সকল ইন্দ্রিয়ই তো নিশ্চল অবস্থায় থাকে, কিন্তু স্বপ্ন যখন দেখো তখন তো ঘুমন্ত অবস্থাতেই দৌড়ানো, খেলাধূলা পড়াশোনা দেখা সাক্ষাৎ সবই চলতে থাকে। কেমন করে সম্ভব হয় এসব? জেগে উঠে কি করেই বা বলো স্বপ্নের সব কথা? বলার তো কথা নয়। তখন তো মনের দিকটা death-এর অবস্থায় থাকে। Sleeping condition আর death condition তো একই। ঘুম তো মৃত্যুরই ছোটো ভাই। কিন্তু সেখানেও এমন একটা অবস্থায় ছিলে যে অবস্থায় তুমি নানা কার্য্যকলাপ করতে সক্ষম হয়েছো।

জেগে উঠে স্বপ্নের সব ঘটনা যে তুমি বলছো সেখানে তো কোনো ফাঁকি নেই। তোমার স্পষ্ট মনে আছে তুমি ভজহরির দোকানে গিয়ে মিষ্টি খেয়েছো। কি কি মিষ্টি খেয়েছো সেটা পর্য্যন্ত তোমার মনে আছে। কি করে মনে থাকে? কি করে বলছো সে সব কথা জেগে উঠে? গভীর ভাবে চিন্তা করার বিষয় এটা। এই ইঙ্গিতের মাধ্যমে nature কি জানাতে চাইছে তা আগেই বলেছি। বালি, অঙ্গার প্রভৃতির ভেতর দিয়ে জলকে filter করে ঘোলা জলকেও স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ করা যায়। স্বপ্নের মাধ্যমেও মনের সেই জাতীয় ক্রিয়াই চলছে। জাগ্রত অবস্থায় তোমার বুদ্ধি, বিবেচনা বাস্তবের ঘাত প্রতিঘাতে বার বার আহত হয় বলেই মনের অনেক ইচ্ছাই সফল হয় না। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে স্বচ্ছ মনে কাজ করা তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু নিদ্রিত অবস্থায় মন যেন মুক্তাকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। তখন দ্বিধাহীন ভাবে তুমি যা চিন্তা করো সেটাই যেন সফল হয়ে যায়। মনের এই অবস্থায় ইচ্ছা করলে তুমি জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারো, আকাশে উড়ে যেতে পারো, যা খুশি তাই করতে পারো। মনটাকে কেউ তখন কোনো বাধা দিতে পারছে না। জাগ্রত অবস্থার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যুক্ত ঘোলাটে মনটা যেন স্বপ্নের ছাঁকনিতে পরিস্কার হয়ে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সুন্দর ভাবে প্রকৃতির অনন্ত গতির সাথে গতি মিলিয়ে আপনমনে অবাধ

গতিতে অনন্ত ধারায় বইতে থাকে। দেহরূপ পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত পাখি যেন মুক্তাকাশে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। জাগ্রত অবস্থার ক্ষুদ্র সত্তাটিই যেন নিদ্রার মাধ্যমে স্বপ্নের অবস্থায় অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিজের ব্যাপক সত্তাকে, তার বিরাটত্বকে অনুভব করতে পারে। তাইতো বলছি নিদ্রাও ক্ষণিকের মৃত্যু, নিদ্রাও এক জাতীয় সমাধি। তবে নিদ্রা থেকে আবার জাগ্রত হওয়া যায়, কিন্তু মৃত্যুরূপ সমাধিতে লীন হলে আর ফিরে আসতে পারা যায় না। প্রতিদিনের যে ঘুম এক বছরের সেই ঘুম একত্রিত হলেই তা মৃত্যুতে পরিণত হবে। তখন কিন্তু তুমি আর নেই। কেউ যখন অজ্ঞান হয়ে যায় বা স্বপ্ন দেখে অথবা যখন ডেলিরিয়াম হয়, সেই অবস্থায় মন দেহের মাঝে জাগ্রত অবস্থার মতো নিজস্ব সত্তায় থাকে কি? এই অবস্থায় মন দেহের মাঝে নিজস্ব সত্তায় থেকেও যেন একটু বাইরে থাকে। তাই সে সব অবস্থার সব কথা সব সময় মনে থাকে না। সমাধি অবস্থায়ও সব যে মনে থাকে তা নয়।

ঘুমের মাঝে dream হতে পারে, কিন্তু ৩৬৫ দিনের ঘুম একত্র হলে সেই ব্যক্তির dream কোথায় যাবে? তখনকার যে ঘুম, মৃত্যু নামে যা অভিহিত, সেই ঘুমে যে dream হবে সেটা কেমন হবে? প্রতিদিন নিদ্রার মাধ্যমে যে স্বপ্ন দেখা সেখানে চিন্তাধারা জলের মতো তরলাকারে থাকে, বরফের মতো জমাট বেঁধে কঠিন আকার ধারণ করতে পারে না। তাই তার কোনো সুসংবদ্ধ রূপও আমরা দেখতে পাই না। স্বপ্নের মাধ্যমে যে সব ঘটনা দেখতে পাই তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। অনেক সময়ই তার মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ৩৬৫ দিনের ঘুম একত্রিত হয়ে যখন dreamটা বেরিয়ে আসে তখন কি হয় জানো? উত্তাপ যখন শূণ্য ডিগ্রীতে নেমে যায় তখন ঘাসে, পাতায়, নদীতে, পুকুরে যেখানে যতো জল আছে সব জলই জমাট বেঁধে বরফাকারে পরিণত হয়। তেমনি মৃত্যুর পর যে dream সেখানে সেই ব্যক্তি নিজেই তার dead body-টা দেখছে কিন্তু সেখানে আর ঢুকতে পারছে না। ঘুমের মাঝে যেটা তরলাকারে ছিলো মৃত্যুতে সেটাই solid হয়ে গেলো। এখনও আমরা কতো কি স্বপ্ন দেখছি, কিন্তু সেটা জমাট বাঁধতে পারছে না বলে life-টা response পাচ্ছে

না। ৩৬৫ দিনের response যেদিন এক দিনে দিতে পারবে সেদিনই তা solid হবে। ৩৬৫ দিনের ঘুমকে একত্র করে যদি নিদ্রিত হও তাহলেই তো মৃত্যু হয়ে গেলো। সেই নিদ্রিত (মৃত) অবস্থার যে স্বপ্ন সেটাই solid হয়ে যাবে, দেহের ভেতরে তখন আর ঢুকতে পারবে না। মৃত্যুর পর সেই solid অবস্থা নিয়েই থাকতে হবে। মৃত্যুর পরও যে কিছু আছে এটাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

প্রতিদিনের ঘুমের মাঝে যে স্বপ্ন দেখি আমরা সে স্বপ্নের কথা যদি জাগ্রত অবস্থায় মনে থাকে তবে মনে থাকার প্রমাণকে মেনে নিয়েই এই solid অবস্থার কথা বলা হচ্ছে। স্বপ্নে ঘটনা যাই ঘটুক না কেন তাকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমি গুরুত্ব দিচ্ছি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের ঘটনাবলীকে মনে রাখার ব্যাপারটিকে। জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নের ঘটনা যদি মনে না থাকতো তাহলে সব minus করে দিতাম। স্বপ্নের মধ্যে যে ঘটনা ঘটছে তা যেন ঘুম ভাঙ্গার পর তোমাকে সজাগ করে দিয়ে বলছে, 'মৃত্যুর পরও কেমন নাচানাচি করে ছেড়ে দিলাম।'

তুমি যখন ঘুমিয়ে আছো তখনও সজাগ আবার জেগেও সেই সজাগ। ঘুমিয়ে থেকে নিদ্রার মাঝে যে সজাগ তার সেই মাত্রাকে জাগরণের সজাগের সাথে যুক্ত (plus) করতে পারলেই স্বপ্নের যে কার্য্যাবলী, জাগ্রত অবস্থায় যা অসম্ভব বলে মনে হয়, জাগ্রত অবস্থাতেও অতি সহজে তুমি সে সব অসাধ্য সাধন করতে পারবে। আর মৃত্যুর পরের যে solid অবস্থা-এই দুইয়ের মাঝখানে মৃত্যু যেন ছাঁকনির কাজ করছে। নিদ্রার চরম অবস্থাই তো মৃত্যু।

স্বপ্ন তো সবাই দেখছে। সেই স্বপ্ন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে খেয়াল করবে। স্বপ্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই যে ঘুমের পর প্রতিদিনই সজাগ হচ্ছো তার মানে সাময়িক মৃত্যুর পরেও প্রতিদিনই সজাগ হচ্ছো। আবার ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে যে সজাগ ছিলে-সজাগ হয়ে, জাগ্রত হয়ে সেই সজাগের কথা মনে করতে পারছো। কতো বড় কথা এটা! প্রকৃতির এটা কতো বড় দান! মৃত্যুর পরও সজাগ কিছু না থাকলে স্বপ্নের সেই সজাগের কথা মনে করতে পারতে না। এর একটি কথাও অবান্তর নয়, অবাস্তব নয়। প্রতিটি কথাই

mathematical calculation করে করা হয়েছে। ঘুমিয়ে থেকেও যে সে সজাগ তা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে স্বপ্নের মাধ্যমে। সজাগ না থাকলে ঘুম থেকে জেগে স্বপ্নের কথা বলতে পারতো না। এই যে জেগে উঠে তুমি স্বপ্নে দেখা মৃত বাবার কথা বলতে পারছো, এটা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? প্রকৃতি যেন বারবার করে ডেকে সবাইকে বলছে, 'হে পথিক! ভুলে যেও না প্রতিদিন ঘুমের মাঝে আমি তোমায় কোথায় রাখি।' প্রত্যেকের কাছে এ এক পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার। তুমি তো মৃতবৎ ঘুমিয়ে আছো, কিন্তু তোমাকে নিয়ে যে কতো টানাটানি চলছে তা তো অস্বীকার করতে পারো না। স্বপ্নের ঘটনাগুলো অলীক বা false যাই হোক না কেন, জাগরণের পরও যে স্বপ্নের কথা মনে করতে পারছো, স্বপ্নে মৃত বাবাকে দেখে পরদিন ভোরবেলা যে সে কথা মনে করে তুমি কাঁদছো তা থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে চরম ঘুমে ঘুমিয়ে থেকেও তুমি জাগ্রতই থাকবে। তাহলে সেই গভীর ঘুম, যাকে মৃত্যু বলা হয় এখানে, যখন আসবে তখন কি সব শেষ হয়ে যাবে?

একটা সত্তা সব সময়ই আমাদের মাঝে জাগ্রত থাকে। এই জাগ্রত সত্তা সব সময়ই সজাগ থেকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তুমি যদি সর্বদা জাগ্রত থেকে মৃত্যুর কথা স্মরণ রেখে চলতে পারো, সমাধিতে যে ঘটনা ঘটে সমাধি ভঙ্গের পরও যদি তা মনে থাকে তবেই হবে চরম ও পরম প্রাপ্তি। সেদিন ঐ ঘটনাগুলো বাস্তব জীবনেও ঘটতে বাধ্য। যে কোনো সমাধিতে যে কোনো ঘটনা ঘটবে, এটাই নিয়ম। এই যে সমাধি, এটাই স্বপ্নের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে চরম মাত্রায় গিয়ে শেষ সমাধিতে (মৃত্যু) পরিণত হয়। নিদ্রিত হলে স্বপ্ন চিরকালই থাকবে, আবার জাগ্রত হলে সে ঘটনা স্মরণেও আসবে।

শাস্ত্র-গ্রন্থে যাকে 'অবাঙমানসগোচর' বলা হয়েছে আজও তার সমাধান হয়নি। কিন্তু প্রকৃতি 'অবাঙমানসগোচর' বলে কোনো লুকোচুরি করেনি কারও সাথে। প্রকৃতি স্বচ্ছ ধারায় নিজের দ্বার সবার কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বার বার বলছে, 'হে পথিক! নিজেকে চেনো, জানো। তোমার ঘরেই মূল্যবান বস্তু রয়েছে, খুঁজে বার করো। নিজে যদি খুঁজে বের করতে না পারো সে কি প্রকৃতির দোষ?'

এই যে নিদ্রা, এটা প্রকৃতির মহাদান। আপনমনে ঝিমোতে ঝিমোতে যে ঘুমিয়ে পড়ছো, এই নিদ্রারূপ সমাধিকে অতি সহজেই পেয়ে যাচ্ছো বলেই দাম দিচ্ছো না। এটা মোটেই সাধারণ নয়। ঘুমে নাক ডাকছে, এদিকে সে মাঠে ঘাটে দৌড়াচ্ছে-কোনো খেয়াল নেই। কোন সংজ্ঞা দেবে এই অবস্থাকে?

ঘুমের মাঝেও যেমন সত্তা জাগ্রত থাকে, গাড়ী থেমে থাকলেও যেমন engine-এর ভিতরে steam work চলতে থাকে, তেমনি মৃত্যুর মাঝেও steam work চলছে। Steam (প্রাণ বা চৈতন্য) না থাকলে মৃত্যুর পর দেহের পরিবর্ত্তন হতো না। Steam আছে বলেই natural course-এ দেহ পচে গলে মিশে যাচ্ছে। মৃত দেহ থেকেই পোকা হচ্ছে। যে কোনো পরিবর্ত্তন হলেই বুঝতে হবে steam work চলছে, সেখানে চৈতন্য ঠিকই কাজ করছে। চোখ, মুখ, কান, মস্তিষ্ক আলো জল ও বাতাস ছাড়া নয়। এই steam-ও ঐ steam ছাড়া নয়। এই steam-ই জাহাজকে গরম করে রাখে। সুতরাং অন্য কিছুর দরকার নেই। আমি দেখবো প্রকৃতির ধারাপাতা, দেখবো প্রকৃতির গণিতে কি আছে।

Steam হতে cream হওয়া দরকার। শিশুও স্বপ্ন দেখে, কিন্তু স্মৃতিতে তা ধরে রাখতে পারে না। তাই তার দেখাটা জমাটও বাঁধছে না। Cream আর তাই হলো না। তোমরা আর শিশুর মতো অবুঝ হয়ে থেকো না। প্রতিদিনের ঘুমের মাঝে স্বপ্নের মাধ্যমে জাগরণের যে সাড়া, যে মহা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে, সেই ইঙ্গিতের ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে যাও। অজ্ঞানতা দূর করে নিজের প্রকৃত সত্তাকে, বিরাটের বিরাট সত্তাকে জাগরণের সুরে জাগিয়ে তোলো। নিজেকে তরলাকারে না রেখে বরফের মতো জমাট বেঁধে নাও। প্রকৃতি চাইছে প্রতিটি জীবের সত্তা এমনভাবে জমাট বেঁধে যাক যেখানে জন্মমৃত্যু বাসা বাঁধতে পারবে না। বীজ থেকে গাছ, আবার গাছ থেকে সেই বীজ। জীবকুলও কি এভাবে ক্রমান্বয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রেই আবর্ত্তিত হবে? লয় ও ক্ষয়ের মাঝে জীবকুলকে আবর্ত্তিত করাই কি প্রকৃতির উদ্দেশ্য? তা তো নয়। এতে সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। প্রকৃতি চাইছে সবাই এই লয় ও ক্ষয়ের ঊর্দ্ধে যাক, জন্মমৃত্যুর ছক হতে বেরিয়ে আসুক। এটাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এর জন্যই সৃষ্টি সবার।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে চুল পাকে, ক্রমে ক্রমে ঝরে পড়ার সময় হয়ে যায়। সাথে সাথে মস্তিষ্কও সুপক্ক (matured) হয়। প্রকৃতির কথা হলো, নিজের পক্কতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হও। তুমি সুপক্ক হচ্ছো কিনা, solid হচ্ছো কিনা বুঝে নাও। স্বপ্নে এখন solid হতে পারছো না, কিন্তু যখন solid হয়ে যাবে তখন মনে হবে, 'এখানে আছি, আবার কোটি কোটি মাইল দূরত্বেও আছি।' একবার solid হতে পারলে যেখানে যখন ইচ্ছা যেতে পারবে, যা খুশি তাই করতে পারবে। কোনো অসুবিধাই হবে না। মনে হবে সেটাই সবচেয়ে সহজ কাজ। Dream-টাই দানা বেঁধে solid হয়ে যায় যদি field work করতে পারো। এটাকে বলে metre work. এই কাজটা যদি গুছিয়ে নিতে পারো, স্বপ্নে মন যে মাত্রায় থাকে সেই মাত্রাকে যদি জাগ্রত অবস্থায় এনে তার সাথে যুক্ত করে দিতে পারো তাহলে তোমার মনোবল অনেক বেড়ে যাবে। সে অবস্থায় শূণ্যে ওড়া, জলের উপর দিয়ে দৌড়ানো-সবই সম্ভব। সকল অসম্ভবই তখন সম্ভব মনে হবে। স্বপ্নে মনের একাগ্রতা অনেক বেড়ে যায়, আর সেই অবস্থাকে জাগ্রত অবস্থায় টেনে আনতে পারলে জাগ্রত অবস্থাতেও সবকিছুই সম্ভব করা যায়।

স্বপ্নে অনেক সময় আমরা সজাগ হয়ে ভাবি, 'আমি কি স্বপ্ন দেখছি?' এই যে সচেতনতা তার মাত্রাটিকে জাগ্রত অবস্থায় যুক্ত করে দিতে পারলেই হয়ে গেলো। জাগ্রত অবস্থায় যদি সব সময় মনে করো, 'আমার ঘুমটা কি রকম আমি দেখবো' এবং তা যদি দেখতে সক্ষম হও তা হলেই স্বপ্নের মনের মাত্রাটির সাথে জাগ্রত অবস্থার মনের মাত্রা যুক্ত হয়ে যাবে। এক মুহূর্তের জন্যও যদি কারও মনে আসে, 'দেখি তো আমার ঘুমটা ঠিক আছে কিনা' তাহলেই অনেকটা হয়ে গেলো। এক সেকেণ্ডের এই চিন্তাধারাকে যদি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়ে নেওয়া যায় তাহলেই তুমি মৃত্যুর পরের অবস্থা নিজেই দেখতে পাবে।

চিন্তা করে দেখো তো প্রতিমুহূর্তে আমাদের প্রত্যেকের কাছে যার যার নিজের জীবনটাই আলাদাভাবে response দিচ্ছে কিনা? আমরা সবাই তো প্রশ্ন আর উত্তরের মাধ্যমে সব সময় মনে মনে কতো কথা বলে চলেছি। আমরা টেরও পাচ্ছি না কিন্তু আপনমনে brain-work ঠিকই চলছে।

এভাবেই প্রকৃতি আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের সত্তা (আত্মা) প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে আমাদের কিছু না জানিয়ে আপনমনে কথা বলে চলেছে সে আমাদের দেহ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তোমার নিজের দেহের মধ্যেই তুমি আলাদা একটি ব্যক্তি। এই যে আমরা দেখছি, কথা বলছি-কে দেখছে, কেই বা কথা বলছে? তাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সে শুধু আপন চেম্বারে থেকে নাটক করে যাচ্ছে। আজও সেই ব্যক্তি (তাকে ব্যক্তি বলেই অভিহিত করছি) বা sense বা চৈতন্য তোমাকে আশ্রয় করে থাকলেও পারদের মতো তোমা হতে আলাদা হয়ে আছে, একেবারেই মিশছে না।

তোমার সত্তা, তোমার বলে যেটা বলছো, সে যে তোমার দেহ হতে আলাদা হয়ে ফুস করে কখন চলে যায় তুমি জানতেও পারো না। স্বপ্নের মধ্যে সে তার নিজস্ব সত্তার কিছুটা পরিচয় দিচ্ছে। দেহটা হচ্ছে carrier মাত্র। তার নিজস্ব কোনো function নেই। সেই বিরাট সত্তার সে সাহায্যকারী মাত্র। তাইতো সেই সত্তা বেরিয়ে গেলে এই দেহের আর কোনো মূল্যই নেই। সেই হচ্ছে মালিক। তাই সে থাকলে তবেই চোখ দেখে, কান শোনে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণ করে। নিজস্ব বলতে দেহের কিছুই নেই। নিজের বলতে দেহের সত্যি যদি কিছু থাকতো তবে অন্যের চোখ এই দেহে লাগিয়ে দিলে দেখতে পারতো না, অন্যের heart বা lungs লাগিয়ে কাজ চালাতে পারতো না। দেহের তবে কি কোনোই দরকার নেই? অনন্ত বিশ্বে এই যে অগণিত রূপ তার কি কোনোই সার্থকতা নেই? এই যে রূপে রূপে এতো রূপান্তর চলছে সর্বত্র, এটা কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? শূণ্য ফাঁকা হয়েও রূপ নিয়ে solid হতে চায়। ফাঁকা যেন আঁকার মাঝেই বলে চলেছে, 'আমি যেন আঁকার মাঝে থেকে একটা রূপ নিতে পারি।' এই রূপ নেওয়ার জন্যই, solid হওয়ার জন্যই যেন সে গোটা দেহকে আশ্রয় করে রয়েছে। শূণ্যই sense হয়ে আপন চেম্বারে বসে চোখে ব্যাটারী লাগিয়ে দেখছে, কানে ব্যাটারী দিয়ে শুনছে। প্রশ্ন, উত্তর, আলাপ, আলোচনা-সর্বত্রই তার অস্তিত্ব বিদ্যমান। অথচ তোমার দেহের মাঝে থেকেও সে সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্তা, সম্পূর্ণ আলাদা। যতোই তাকে যন্ত্রে বাঁধতে চেষ্টা করো না কেন সে কিন্তু বাঁধা পড়ছে না কিছুতেই।

সব সময় তোমার মাঝে যে একটা চিন্তা বয়ে চলেছে এটাই সেই সত্তা। এভাবেই সে বেরিয়ে যাচ্ছে, তোমার মাঝে থেকেও তোমাতে নেই। সে একবার দেহ থেকে বেরিয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। চোখ, কান, নাক জিহ্বা সবই রয়েছে-কিন্তু কেহই তখন আর কোনো কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে না। যে thought-টা বেরিয়ে যাচ্ছে সেটাই আবার solid হয়ে যায়। এরই প্রচলিত নাম মৃত্যু।

গোটা universe-টাই life. ফাঁকা থেকে কি করে জীবনের সৃষ্টি হচ্ছে? এই ফাঁকা বা শূণ্যটাই হচ্ছে sense বা চৈতন্য। তাইতো গোটা বিশ্বই চেতন চৈতন্যে ভরপুর। এই sense-টাই দানা বেঁধে solid হতে চাইছে। এই solid হওয়ার ইঙ্গিত প্রকৃতি প্রতি পদক্ষেপে জানিয়ে যাচ্ছে। তাইতো সবার মুখে একই কথা, 'ভালো হতে চাই, ভালো খেতে চাই, ভালো ভাবে থাকতে চাই।' প্রকারান্তরে প্রত্যেকেই চায় একটু তৃপ্তি, একটু শান্তি। সবাই চাইছে অশান্তি আর জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি। এ সবই materialistic approach.Solid যাতে হতে পারে তার জন্যই নিজের অজান্তে সে approach করে চলেছে। এই যে সবাই তৃপ্তি চায়, সুখ শান্তি চায়-এটা কোথাকার গান, কিসের গান ভেবে দেখেছো কোনোদিন? এটাই হচ্ছে যার যার অন্তর্জগতের সুর। জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বাস্তবের প্রতি বিষয় বস্তুর ভিতরে সাধারণ শান্তি কামনার জন্য যে ব্যস্ততা তার মাঝেও থেকে থেকে বেজে উঠছে সেই অন্তর্নিহিত সুর। সেই সুরকেই সবাই solid (পাকা) করতে চাইছে নিজের নিজের জীবনে। সবারই তাই একই কথা, 'শান্তি চাই, তৃপ্তি চাই, ভালো থাকতে চাই, সুস্থ সুন্দরভাবে জীবন যাপন করতে চাই।' ভালো থাকতে সবাই চায় এখানে, কিন্তু কেউ তো চিরকাল থাকতে পারছে না-সবাই চলে যাচ্ছে। বাবা, বাবার বাবা-সবাই চলে গেছে, তুমিও যাবে। কাউকেই ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে না। কেন পারা যাচ্ছে না বলো তো? সব দুধই যে এখানে তৈরী হচ্ছে কচুরিপানা থেকে। তাই সে দুধ থেকে মাখন আর হচ্ছে না। জীবনভর দুঃখ আর অশান্তি ভোগ করেই চলে যাচ্ছে এখান থেকে সবাই। জমাট আর বাঁধছে না, solid আর হচ্ছে না। মাখন না হওয়ার কাজই করছে সবাই, মাখন আর তাই হতে পারছে না। সারা জীবনেও solid

আর হতে পারছে না। এসব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে nature বলছে সবাইকে, 'দেখো আর শেখো। সময় নষ্ট কোরো না। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারা অনুসরণ করো, প্রকৃতির আদর্শলিপি পাঠ করো, সেই ছন্দে ছন্দে জীবন তরী বেয়ে চলো। সহজেই তখন প্রকৃতির মাঝে মাখনের মতো নিজস্ব সত্তা নিয়ে সর্বত্র বিরাজ করতে পারবে।' আমাদের সবার প্রতি কামনা বাসনায় জীবনের যে শেষ চাওয়া সেই পরম শান্তি লাভের এটাই একমাত্র পথ। তোমরা সারা জীবন সাগরের পারে শুধু ঝিনুকই কুড়িয়ে গেলে, মুক্তা মিললো কি? হে পথিক! হে যাত্রিক! এভাবে এখানে শান্তি পেতে পারো না। শান্তি পাওয়ার পথ এটা নয়। আমাদের হৃদযন্ত্রের যে ধুপ ধুপ শব্দ, সূর্য্যেরও সেই একই শব্দ-'একটু শান্তি চাই।' এটা এখানকার কথা নয়। এই শান্তির কামনা বাসনাই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সবার অন্তরে, সেটা ওখানকারই কথা। এসবই সুদূরের কথা, সুদূরের বার্তা। আমাদের হৃদয়ের যন্ত্র যদি প্রকৃতির স্বচ্ছ পবিত্রতার ধারায় চলে তবেই আর এখানকার পঙ্কিলতায় পড়তে হয় না। এটা এখানকার কথা নয়, কেউকেটা সাজবার জন্য সাজানো বা বানানো কথাও নয়। আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত সুরে এই কথাগুলো নিরন্তর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। সাজানো কথা হলে যুক্তি বিচারে টিকবে না, প্রমাণে প্রমাণিত হবে না। কিন্তু এই কথাগুলো সবই বাস্তবের ধারায় প্রমাণে প্রমাণিত। যতোই ঢ়াকবার চেষ্টা করো, যতোই সাজুক না কেন, অন্তর্নিহিত এই সুর জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রকাশ পাবেই। মুসলমান যতোই হিন্দু সেজে থাকুক, মরবার সময় 'আল্লা' কথাটি ঠিকই বের হবে, তখন আর 'ভগবান' বের হবে না। তেমনি তোমরা যতোই এখানে ভোগ করো, যতোই ভোগী সাজো, কেউ তাতে তৃপ্তি পাচ্ছে না, সুখী হচ্ছে না। তাইতো সবার মুখেই এক কথা, 'শান্তি চাই'। এভাবেই প্রকৃতি নানা ভাবে, জীবনের নানা দিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আলোর কথা, সূর্য্যদেবতার কথা।

এই যে এখানে এতো কিছু পেয়ে, এতো ভোগ করেও তৃপ্তি হচ্ছে না- কিছুই ভালো লাগে না, সবার মুখেই আফশোষ আর হতাশার কথা-এ সবই তো ফাঁকার কথা। ক্ষণিক তৃপ্তির পরই আবার অতৃপ্তি। কোনো তৃপ্তিই থাকছে না। মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে প্রিয়জনেরা একে একে সবাই চলে যাচ্ছে।

সবই তো ফাঁকায় মিলিয়ে যাচ্ছে, শূণ্যে লীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে ভগবান নেই-দেবদেবতা কিছুই নেই। *নাই*-এর মাঝেই আবার *হ্যাঁ* হয়ে যাচ্ছে। শূণ্যের মাঝেই সমস্ত পূর্ণতা বিদ্যমান। তাইতো প্রতি অঙ্গে অঙ্গে তিলকের মতো arrow দিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির নির্দেশ। পথ চলতে গিয়ে যেখানেই বিপদের সম্ভাবনা সেখানেই arrow দিয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়। প্রকৃতিও সেভাবেই প্রতি ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। সব নির্দেশই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। জীবজগতে যার যার instinct-টাই হচ্ছে প্রকৃতির নির্দেশ স্বরূপ arrow. সেই নির্দেশ বুঝে বুঝে কাজ করে যেতে হবে। তবু যে চলতে গিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাত আসছে, নানা দিকে sense-এর মধ্যে যে difference হচ্ছে, এই difference-টাই sense-কে সজাগ করে দিচ্ছে। এর জন্যই প্রকৃতিগত ভাবে সবার ভিতরে বিবেকের মাধ্যমে consciousness-কে seal করে দেওয়া হয়েছে। বিবেকের নির্দেশ হতে চ্যুত হয়ে যে কাজ করবে তাতেই গরমিল হবে। লোভে মোহে যে যা কিছু করছো তাতেই fall (পতন) হচ্ছে, প্রকৃতির সুরের ধারায় সুর মিলিয়ে আর থাকতে পারছো না। আবার বিবেকের সুরে সুর মিলিয়ে চললেই তুমি solid হতে পারবে। প্রকৃতি প্রতি মুহূর্তে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে, 'এটা করো, ওটা কোরো না।' প্রত্যেকেই বুঝতে পারছে যা করছে ঠিক হচ্ছে না। তবু সবাই কামনা বাসনার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নিজের নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে যাচ্ছে। বিবেকের নির্দেশ মানছে না বলেই তার সাড়াও মিলছে না। Solid হওয়া তাই আর সম্ভব হচ্ছে না।

প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই বহু বহু বিষয়বস্তুর মিশ্রণে মিশ্রিত হতে হতে তবেই একটি রূপ নেয়। যে সন্দেশ, রসগোল্লা তোমরা টপাটপ খাচ্ছো সেগুলো এলো কি করে জানোতো? সবই এসেছে ছানা থেকে। আবার ছানা এসেছে দুধ থেকে। আবার যে দুধ গোরুর বাট থেকে পাচ্ছো সেটা তৈরী হয়েছে রক্ত, মাংস, বীর্য্য, ঘাস, বাতাস, আলো, জল ইত্যাদি বহু বহু বস্তুর মিশ্রণে মিশ্রিত হতে হতে। এভাবেই প্রকৃতির সবকিছু shape নিচ্ছে। প্রকৃতির কথাই হলো, 'আমাকে তোমরা shape-এ আনো।' মানবদেহ হতে শুরু করে জীবজগতের প্রতিটি জীবের দেহই হলো ফাঁকাকে রূপ দেবার, shape-

এ আনার এক একটি instrument. ফাঁকার shape-কে ধরতে পারছে এই একটি মাত্র যন্ত্র। ফাঁকা তো ফাঁকাই, বেরিয়ে গেলে তো বেরিয়েই গেলো। কিন্তু প্রকৃতির গ্রন্থ ঠিক ঠিক পাঠ করে তার নির্দেশ মতো সবকিছু মেনে চললে এই ফাঁকাকেও আটকাতে পারা যায়। ফাঁকা থেকেই বাতাস। জলের মধ্যেও আবার সেই বাতাস। বাতাসকে ধরা ছোঁওয়া যায় না। কিন্তু জল যখন ঠাণ্ডাতে জমে বরফ হয়ে যায় তখন তার ভেতরকার বাতাসকে তো সে আটকাতে পারলো। এভাবেই অনন্ত বিশ্বজগতে যে চৈতন্য ব্যাপ্তমান সেই sense-টা shape নিয়ে solid হয়ে যাচ্ছে। সেই sense-ই বিবেকের sense-এর সাথে মিলে essence হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। যার যার দেহবীণাযন্ত্র ঠিকভাবে বাজাতে পারলে, বিবেকের নির্দেশ মেনে চললে লোভে মোহে আক্রান্ত হবার ইচ্ছাটা (will) বেশীক্ষণ থাকে না। Sense-টা নিজেই যখন solid shape নিয়ে নেয় সে অবস্থায় কথা বলা, চলা ফেরা, খেতে ইচ্ছা করা-সবই solid হয়ে যায়। এভাবে একবার solid করে নিতে পারলে এখানে যা পাচ্ছো তার লক্ষ গুণ ওখানে পাবে। এখানে তোমরা ইচ্ছা করলে এ ঘর থেকে ও ঘরে যেতে পারছো, আর ওখানে ইচ্ছামাত্রই এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে চলে যেতে পারবে। ওখানে যা কিছু হয় তারই reflection (প্রতিফলন) হচ্ছে এখানে। এখানে তোমার চেতন চৈতন্য (sense)-কে দিয়ে তো সবই করে যাচ্ছো। নানাজনের প্রতি কর্তব্য করছো-ভদ্রতা, আতিথেয়তা, আন্তরিকতা ইত্যাদি কতো কি করছো। নিজে না খেয়ে ছেলে মেয়েদের খাওয়াচ্ছো, স্ত্রী পুত্র পরিবারকে রক্ষণাবেক্ষণ করছো। সবইতো এখানে করছো ঐ sense-কে খাটিয়েই। আর এই sense (সত্তা, চৈতন্য)-কেই আটকাতে পারলে, solid করে নিতে পারলে তোমার ক্ষমতা কোটি কোটি গুণ বেড়ে যাবে। ফাঁকাকে আটকাতে পারলে ইচ্ছামতো চাঁদ থেকে সূর্য্যে, গ্রহ থেকে নক্ষত্রে সর্বত্রই যাতায়াত করতে পারবে অতি সহজেই। জায়গায় জায়গায় ঘুরেও তোমার নিজস্ব সত্তা, তোমার shape নষ্ট হবে না। তোমার solid অবস্থা ঠিকই থেকে যাবে। প্রয়োজনে তুমি নিজেই নিজেকে guide করতে পারবে, স্বেচ্ছাধীনে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে সবকিছু করে যেতে পারবে। ঐ sense দিয়েই তখন সব কাজ চলবে। একমাত্র এই

দেহযন্ত্র দিয়েই ফাঁকাকে আটকানো সম্ভব। তখন বুঝতে পারবে কি বিরাট ক্ষমতা তোমার এই সাড়ে তিন হাত দেহযন্ত্রের। তাই যা করার দেহ থাকতে থাকতেই, দেহ নিয়েই করতে হবে। নিজের হাত দিয়ে তুমি নিজেকে চুলকাচ্ছো, নিজের অনুভূতি নিজেই বুঝতে পারছো। এ যেন নিজেকেই তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছো। কতো বড় কথা, কি বিরাট ক্ষমতা, একবার ভাবো তো! অতি সহজে পাচ্ছো বলেই দাম দিতে পারছো না। প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে সজাগের ধারায় তোমাকে সচেতন করে চলেছে, 'হে পথিক! এক মুহূর্ত সময়ও আর নষ্ট কোরো না। সবই তো ফেলে চলে যেতে হবে। যা থাকবে না তা নিয়ে কেন বৃথা সময় নষ্ট করছো? সময় থাকতে থাকতে সংসারের এই অসার থেকে সার খুঁজে নাও। Sense-কে solid করার চেষ্টা করো। দেহযন্ত্রটা একবার ভালো করে বাজাও আর বিবেকের সাথে হাত মিলিয়ে চলো। তবেই জন্মমৃত্যুর আবর্তন হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির বিরাট উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারবে।'